গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১৫ - ২১ জুলাই, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

আন্দোলনের চাপেই নয়ডায় জমি ফেরতের রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট

উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রায় দিতে গিয়ে ৫ জুলাই এ কথা স্বীকার করেছে যে, দেশে গরিবদের কাছ থেকে জমি কেড়ে বড়লোকদের জন্য শপিংমল, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স আর বিলাসবহুল আবাসন তৈরির জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে। 'শিল্প' করার নামে এটাই বাস্তবে সারা দেশ জুড়ে চলছে। 'শিল্পের জন্য জমি চাই' বলে যে প্রচার সরকার ও কর্পোরেট পুঁজিপতিরা তুলছে, সেটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। আবাসন তৈরিকেই এখন শিল্প বলে চালানো হচ্ছে।

গ্রেটার নয়ডার লাগোয়া গুলিস্তানে শিল্প গড়ার নাম করে ১৭০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করেছিল মায়াবতী সরকার। এই অধিগ্রহণকে জনস্বার্থ হিসাবে দেখিয়ে অধিগ্রহণ আইনের বিশেষ ধারায় সরকার একে 'জরুরি' বলে ঘোষণা করেছিল, যাতে কৃষকরা কোনও ভাবে আপত্তি তুলতে না পারে। সাধারণত রাস্তা, রেললাইন, ব্যারেজ প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রেই এই জরুরি ধারা প্রয়োগ করা হয়। অধিগ্রহণের পর এই জমি গ্রেটার নয়ডা শিল্পোন্নয়ন অথরিটি তুলে দেয় বৃহৎ আবাসন ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা সেখানে শপিং মল, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, বিলাসবহুল আবাসন, সুইমিং পুল ইত্যাদি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই অধিগ্রহণকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং অধিগ্রহণের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। তার বিরুদ্ধে নয়ডা শিল্পোন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলি সুপ্রিম কোর্টে যায়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্ট উপরের কথাগুলি বলে এবং ১৫৬ হেক্টর জমি কৃষকদের ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় ও কর্তৃপক্ষকে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করে।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ক্ষমতার অপব্যবহারের আদর্শ নিদর্শন গুলিস্তানের এই জমি অধিগ্রহণ। যে উদ্দেশ্যে গরিবদের জমি নেওয়া হয়েছিল, সার্বিকভাবে তা লঙ্ঘিত হয়েছে। বিচারপতিরা মায়াবতী সরকারের 'জরুরি' ধারা প্রয়োগের উল্লেখ করে বলেন, ঔপনিবেশিক আইনকে ব্যবহার করে গরিব সাধারণ মানুষকে দুর্দশায় ফেলা হচ্ছে। বি এস পি পরিচালিত রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বিচারপতিরা যা বলেছেন, তা শুধু মায়াবতী সরকারই নয়, কেন্দ্র-রাজ্যে ক্ষমতাসীন প্রতিটি সরকার সম্পর্কেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাঁরা বলেছেন, বিশ্বায়নের নামে মানুষকেই কোণঠাসা

সাতের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

রানি রাসমণি অ্যাভেনিউ, বিকাল-৪টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু

কমরেড শিবদাস ঘোষের

উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

৪-৫ আগস্ট

এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেল

উদ্বোধক ঃ কমরেড শঙ্কর সাহা

বছরে মানুষের বাড়তি ব্যয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা

মূল্যবৃদ্ধি যে আজ কী ভয়াবহ সমস্যা, তা কাউকে বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। বাজারের সঙ্গে যাঁর সামান্য সম্পর্ক আছে তিনিই জানেন, মূল্যবৃদ্ধি আজ কোন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। চাল, ডাল, তেল, নুন, শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ — যাই কিনতে যান, দাম শুনে সাধারণ মানুষ আঁৎকে উঠছেন। অথচ বেঁচে থাকতে গেলে খাদ্য ছাড়া তো উপায়ও নেই। ফলে মানুষকে প্রয়োজনে সাধ্যের বাইরে গিয়েও খরচ করতে হচ্ছে। আবশ্যিকটুকু কিনতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই টান পড়ে বাকি সমস্ত প্রয়োজনে; নুন কিনতে গিয়ে দেখা যায় আর পাস্তার সংস্থান নেই।

অর্থনীতিবিদদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করুন। উত্তর পাবেন 'মুদ্রাস্ফীতি'। সহজ বাংলায় কথাটির অর্থ টাকার দাম কমে যাওয়া। অর্থাৎ, আগে এক টাকার বিনিময়ে বাজার থেকে যতটা জিনিস

জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি

কিনতে পারা যেত, এখন তার থেকে কম জিনিস কিনতে পাওয়া যাবে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কখন কতটা চড়ছে, এই মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করে তার একটা হিসাব পাওয়া সম্ভব।

রিপোর্ট বলছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে এই মুদ্রাস্ফীতির হার বর্তমানে খুবই বেশি। গত ২০০৮-'০৯ আর্থিক বর্ষ থেকে বর্তমান ২০১০-'১১ আর্থিক বর্ষ পর্যন্ত এর গড় হার দেখা যাচ্ছে প্রায় ৮ শতাংশ। অথচ ২০০৫-'০৬ থেকে ২০০৭-'০৮ আর্থিক বর্ষ পর্যন্ত এই হারের গড় ছিল ৫ শতাংশের মতো। অর্থাৎ গত ৩ বছরে এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে তার আগের ৩ বছরের তুলনায় ৩ শতাংশের মতো বেশি। এর অর্থ কী? এর অর্থ বোঝা যাবে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষার রিপোর্ট দেখলে।

ক্রিসিল রেটিং এজেন্সি পরিচালিত এই সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ, গত ৩ আর্থিক বছরে মুদ্রাস্ফীতির হারে এই অতিরিক্ত ৩ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র সংসার চালাতে ও বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ মেটাতে এ দেশের মানুষকে অতিরিক্ত মোট ৫ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। শুধুমাত্র ২০১০-'১১

পাঁচের পাতায় দেখুন

পি চিদম্বরমের ঘোষণার প্রতিবাদ করে যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানাল এস ইউ সি আই (সি)

জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ৫ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেছেন,

"জঙ্গলমহলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে যৌথবাহিনীর অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম বলেছেন, রাজ্য সরকারের তরফেও এই অভিযানের প্রয়োজন তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

জল খেতেও দাম দিতে হবে, ফরমান দিল্লির কংগ্রেস সরকারের

পানীয় জলের বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকিকরণের প্রতিবাদে ৬ জুলাই দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর অভিযান। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার, পাশে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল এবং দিল্লি রাজ্য কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সাতের পাতায়।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, সারের কালোবাজারির প্রতিবাদে

দুই মেদিনীপুর জেলায় বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ মানুষ যখন মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে, তখন আর এক দফা পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় সরকার। এরই প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির নেতৃত্বে ৭ জুলাই পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষের এক প্রতিবাদদৃপ্ত মিছিল তমলুকের মানিকতলা মোড় থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল মোড় হয়ে জেলাশাসক অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখায়। জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতির নেতৃত্বে জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস তপন ভৌমিক, মানিক মাইতি, হীরেন্দ্রনাথ জানা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের উদ্দেশে লিখিত স্মারকপত্র এ ডি এমের হাতে তুলে দেন। এ ছাড়া কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম, সারের কালোবাজারি বন্ধ করার দাবি জানান।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ নারায়ড়গড়ে একই দাবিতে ২ জুলাই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। সারে পর্যাপ্ত ভরতুকি দেওয়া, অবিলম্বে কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের দাবি ওঠে। পাঁচ শতাধিক মানুষের এক বিক্ষোভ-মিছিল প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে খুড়সী গ্রামে গিয়ে শেষ হয়। উল্লেখ্য, সিপিএম থেকে বেরিয়ে আসা বহু মানুষ এই মিছিলে যোগ দেন। এখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সূর্য প্রধান, লোকাল সম্পাদক কমরেড ধীরেন ওঝা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেডস তাপস কুইল্যা, শচীন মাইতি, সজল সামন্ত, ক্ষুদিরাম সিং। এই মিছিল এলাকার মানুষকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে।

চাষ বন্ধ হল, শিল্পও হল না, আন্দোলনে নূতনডি

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের নূতনডি অঞ্চলের ১১টি মৌজার ৩৮০০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ২০০৭ সালে নোটিশ জারি করা হয়। তার মধ্যে ১২৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করে জয় বালাজি গ্রুপকে দেওয়া হয়েছে। ঐ জমিতে স্টিল প্ল্যান্ট, সিমেন্ট কারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্রুত গড়ে তোলা হবে বলে প্রচার করে বালাজি গ্রুপ। আজ পর্যন্ত অধিগৃহীত জমিতে বেড়া দেওয়া এবং বুলডোজার চালিয়ে দুই ফসলি জমিগুলির আলগুলো ভেঙে দেওয়ার কাজটি হয়েছে। ২০০৭ থেকে চাষ বন্ধ। অথচ শিল্পও গড়ে ওঠেনি। নিরুপায় হয়ে এই অঞ্চলের চাষিরা মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে 'নূতনডি অঞ্চল ল্যান্ড লুজার অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংগঠন দাবি তুলেছে অবিলম্বে এই এলাকায় মূল শিল্পের কাজ শুরু করে এলাকার মানুষদের কর্মসংস্থান করতে হবে। নচেৎ ঐ জমিতে চাষিদের চাষের কাজ করতে দিতে হবে। এই দাবি এসডিওকে জানানো সত্ত্বেও কোনও প্রতিকার না পাওয়ায় কৃষকরা জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়ে গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠনের কাজ চালাচ্ছে। তাদের এই সংঘবদ্ধ শক্তিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য জয় বালাজি গ্রুপ স্থানীয় মার্কামারা সিপিএম নেতা উজ্জ্বল গুরুকে নিয়োগ করে। তার নেতৃত্বে বাদল খালুই, বাসুদেব চ্যাটার্জীরা নানান অপকৌশলে সাধারণ মানুষদের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আর এটাকে মদত দিচ্ছে সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। তারা অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠক কিরিটি মাজী, দিলীপ মিশ্র প্রমুখদের নামে রঘুনাথপুর থানায় মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এর প্রতিবাদে ২৯ মে সহস্রাধিক নারী-পুরুষ রঘুনাথপুর থানা ঘেরাও করে। ২৩ জুন নূতনডি অঞ্চল ল্যান্ড লুজার অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ত্রিলোক মাজীর নেতৃত্বে দিলীপ মিশ্র, সৌমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কিরিটি মাজী, ব্রজগোপাল মুদি, শক্তিপদ মাজী, বিমল মল্লিক এস ডি ও-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। অবিলম্বে মূল শিল্পের কাজ শুরু করে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান, ল্যান্ড লুজার সার্টিফিকেট, অমীমাংসিত জমির সুষ্ঠু মীমাংসা করে বাকিদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। দাবি না মিটলে আরও জোরদার আন্দোলন চলবে বলে অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে।

হাবড়ায় মোটর ভ্যানচালকদের দাবি আদায়

২৮ জুন সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডাকে হাবড়া পৌরপ্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। হাবড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর। এই শহরের পাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোটরভ্যান চালকরা সবজি ও চাল এনে শহরের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যানজটের অজুহাতে পৌরসভার পক্ষ থেকে সকাল ৬টা-১২টা এবং বিকাল ৪টা-৯টা পর্যন্ত পুরএলাকায় মোটরভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার প্রতিবাদে তিন শতাধিক মোটরভ্যান চালক হাবড়ার জয়গাছি সুপার মার্কেটে জমায়েত হয়ে মিছিল করে হাবড়া পুরসভার সামনে আসে। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা। বেশ কিছুক্ষণ টালবাহানার পর পুরপ্রধান ডেপুটেশন নিতে সম্মত হন। সংগঠনের দাবি অনুযায়ী বেলা ১০টা-১২টা এবং বিকাল ৪টা-৬টা এই সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময় মোটর ভ্যানচালাচল করতে পারবে এই সিদ্ধান্ত হয়। আন্দোলনের এই জয়ের ফলে মোটরভ্যান চালকদের মধ্যে খুশির বাতাবরণ তৈরি হয়। প্রতিনিধি দলে সংগঠনের জেলা সম্পাদকের সঙ্গে সম্পাদক গৌতম দাস, সভাপতি পিয়ার আলি এবং তারক দাস ও জননেতা সাধন ঘোষ ছিলেন।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সারাদিনব্যাপী ধর্না

৯ম দ্বিপাক্ষিক কালা বেতন চুক্তি, ব্যাঙ্কশিল্পে বিলগ্নিকরণ ও আউটসোর্সিং-এর প্রতিবাদে এবং সবার জন্য ১৯৯৫ সালের চালু পেনশন, সমস্ত ক্যাজুয়াল কর্মী, কন্ট্রাক্ট কর্মী, ক্যান্টিন কর্মী ও ড্রাইভারদের স্থায়ী চাকরি, সমস্ত পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম করা, নিউ পেনশন স্কিম বাতিল করা ও খান্ডেলওয়াল কমিটির সুপারিশ বাতিলের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ৫ জুলাই বিবাদী বাগে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সামনে সারাদিনব্যাপী অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল এ আই বি ই এ, বি ই এফ আই নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিশ্বায়নের নীতি মেনে এই নেতৃত্বই আউটসোর্সিং, নিউ পেনশন স্কিম, অতি নিম্ন বেতন কাঠামো, জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার ইস্যু, প্রকারান্তরে কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়মেন্ট থেকে শুরু করে ঐ সমস্ত বহুবিধ ব্যাঙ্ক কর্মচারী, গ্রাহক ও বেকার যুবসম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী বিষয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় চুক্তি করে এসেছে। ফলে তারা আন্দোলন-আন্দোলন খেলা করতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রতিরোধ আন্দোলন করতে পারে না। তাই ব্যাঙ্কশিল্পে কর্মচারী স্বার্থরক্ষাকারী যথার্থ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে আজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামকেই শক্তিশালী করতে হবে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, কমরেডস গৌরীশঙ্কর দাস, আলোকতীর্থ মণ্ডল, সোমনাথ মাইতি, অলোক মুখার্জী, কে জি সাহা, অরূপরতন সাহা, শ্রীরূপ দাস, গৌতম পাল, মেহবুব আহমেদ, পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, বসন্ত রায়, গণেশ থাপা, বিজন ভট্টাচার্য, অশোক নস্কর, অতীন পাঠক, সতীশ পাঠক, চণ্ডী ব্যানার্জী প্রমুখ।

বীরভূমের গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ, ঘেরাও

পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, পানীয় জলের নলকূপ মেরামত, রাস্তা সংস্কার, নিয়ম মেনে খাস জমি ও পুকুর লিজ দেওয়া, বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা প্রদান, দলবাজি বন্ধ করা, ইন্দিরা আবাস প্রকল্পের টাকা প্রদান, ত্রুটিপূর্ণ বিপিএল তালিকা সংশোধন, সরকারি দামে রেশনদ্রব্য দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে ১ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজগ্রাম স্টোন কোয়ারি ইউনিটের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামের দুই শতাধিক মানুষ মুরারই থানার মহুয়াপুর গ্রামপঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখান এবং ২ ঘণ্টারও বেশি সময় প্রধানকে ঘেরাও করে রাখেন। প্রধান দলের প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন এবং সমস্ত দাবিগুলি সঠিক বলে সহমত পোষণ করেন। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান। প্রধানের সাথে আলোচনায় অংশ নেন কমরেড আনসারুল সেখ, বেজন রবিদাস, মুনসের সেখ, পানতল সেখ, পীরু সেখ, জাকির সেখ, নাজিবুল সেখ প্রমুখ।

পরিচারিকা সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

৩০ জুন বাঁকুড়ার ডি ও সি হলে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ ও হুমকি সত্ত্বেও প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিচারিকা মা-বোনেরা সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন।

শুরুতে পরিচারিকাদের জীবনযন্ত্রণার উপর রচিত সংগীত পরিবেশন করেন কমরেড সুষমা মাহাতো। নিজেদের জীবনের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন, পদ্মা দাস, ষষ্ঠী বাউরী, প্রতিমা রুইদাস, আন্না লোহার, ছায়া দাস, সন্ধ্যা গরাই প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড অঞ্জলি নন্দী। উপস্থিত ছিলেন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড কবিতা সিংহ বাবু। সকল পরিচারিকাদের বিপিএল-এর অন্তর্ভুক্ত করা, সপ্তাহে এক দিন ছুটি, বিধবাভাতা, বার্ধক্য ভাতা, শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি সহ ১০ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড লিলি পাল।

সম্মেলনে কমরেড লক্ষ্মী সরকারকে সভানেত্রী, কমরেড ভারতী দাসকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ১৭ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

এ বার অবসান হোক শিক্ষাক্ষেত্রে সিপিএম সৃষ্ট নৈরাজ্যের

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় এলেন, তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষের বহু প্রত্যাশার মধ্যে অন্যতম — শিক্ষা পাওয়ার অধিকার, শিক্ষার স্তরে স্তরে দলবাজির নিরসন, শিক্ষার মানোন্নয়ন — যা গত তিন দশকে চরম অবনতির শিকার।

১৯৭৭ সালের জুন মাসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় মাত্র দু'মাস পরে তৎকালীন সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যে নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করে, তার মধ্যেই নিহিত ছিল এদের জনবিরোধী চরিত্র। সিপিএম-শিক্ষামন্ত্রী ঐ বছরের ১৩ আগস্ট আহূত সিলেবাস কমিটির সভায় ঘোষণা করেন — প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া হবে, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল লোপ করে সকলকে অটোমেটিক প্রমোশন দেওয়া হবে, প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে ইত্যাদি। সেই সঙ্গে শুরু হয় মাধ্যমিক স্তরে গ্রামার বর্জিত ইংরেজি শিক্ষাদান; কলেজ স্তরে ভাষা-শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করা হয়।

এই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলি তাঁরা ঐ সময়েই গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ছিল — বিভিন্ন স্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত কমিটিগুলি বাতিল করে দলীয় কর্তৃত্ব স্থাপন। এরপর উপাচার্য পদে নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কমিটি ও পদে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ করা প্রায় রেওয়াজে পর্যবসিত হয়। কোনও রকম নিয়ম-নীতি, প্রতিবাদ, আবেদন ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে 'সিপিএমের সদর দপ্তর আলিমুদ্দিন স্ট্রিট যাহা বলিবে, তাহাই শিরোধার্য করিতে হইবে'— এই বিষয়টি চালু হয়।

এই সময় প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত খোলনলচে পাল্টে সম্পূর্ণভাবে দলের কুক্ষিগত করার মরিয়া প্রয়াস দেখা দেয়। জেলায় জেলায় সমস্ত পদে, বিশেষত পূর্বতন জেলা স্কুলবোর্ডগুলিকে (পরবর্তীকালে যা কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়) চেয়ারম্যান পদে মনোনীত ব্যক্তিদের বসিয়ে চরম দলবাজি শুরু হয়। শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব এই সমস্ত বোর্ড বা কাউন্সিলগুলির হাতে দিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি চলতে থাকে। স্বজনপোষণেরও ঘৃণ্য নজির তারা স্থাপন করে, যার নিকৃষ্ট উদাহরণ সাম্প্রতিককালে জলপাইগুড়ি জেলা। বহু নিয়োগ বাতিল এবং কর্মকর্তাদের সরানোর ঘটনাও ঘটেছে। তথাপি এদের ঘৃণ্য কাজের বিরাম নেই। বাহ্যিক আবরণে নির্বাচনী মোড়ক রেখে কাউন্সিলগুলিতে মনোনীত ব্যক্তিদের আধিক্য এবং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী চেয়ারম্যান পদটি নির্বাচনী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে দলবাজির পথ প্রশস্ত করে ৩৪ বছর ধরে যে ঘৃণ্য কাজ এরা চালিয়ে গেছে, জনগণ অবিলম্বে তার অবসান চেয়েছে।

এইরকম আর একটি ঘৃণ্য দলবাজির নমুনা পিটিটিআই কেন্দ্রগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারের, এমনকী নিজেদের তৈরি করা রাজ্যের আইনকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দলীয় নেতা-মন্ত্রীদের আত্মীয় পরিজনদের চুটিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে শতাধিক পিটিটিআই কেন্দ্র খোলা হয়, যেখানে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বেআইনি কাজের পরিণামে ৭৬ হাজার শিক্ষার্থীর শংসাপত্র অবৈধ ঘোষিত হয় এবং চাকরির সুযোগ বিনষ্ট হয়। আন্দোলন ও আদালতের চাপে কিছু নিয়োগ হলেও প্রায় ২৪ হাজার পিটিটিআই শিক্ষার্থীর চাকরির আজও কোনও আশ্বাস মেলেনি। সাধারণ ঘরের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জমি-গয়না বন্ধক দিয়ে, বিক্রি করে এখানে ভর্তি হয়েছিল, পাশ করে একটি চাকরি পাওয়ার আশায়। তাদের জীবন নিয়ে এরা ছিনিমিনি খেলেছে। হতাশায় ১৭টি তাজা প্রাণ বলি হয়। এই অসহায় ছাত্রদের আন্দোলনকে পুলিশ ও ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। বহু মিথ্যা মামলা চলছে। নতুন সরকারকে এদের বাঁচার পথ দ্রুত সুগম করতে হবে। নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণায় ৪৬০০ জনের চাকরি তিন বছরে করার কথা বলা হলেও বাকিদের জন্য কোনও আশ্বাসবাণী না থাকায় এরা চরম হতাশ।

পার্শ্বশিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সিপিএম সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব কার্যত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অন্য বহু রাজ্য যেখানে এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ভর্তুকি দিয়ে বেতন বাড়িয়েছে, তখন এরাই কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ টাকা মেরে দিয়ে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করেছে। বেশ কিছু রাজ্য এঁদের একাংশকে পূর্ণ বেতনের শিক্ষকে উন্নীত করেছে, কিন্তু এই রাজ্য সে পথে না গিয়ে দলীয় ব্যক্তিদের স্বার্থে হীন অপচেষ্টা চালিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণা আরও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

আজও এ রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য। ১/২ জন শিক্ষক দিয়ে এখনও ২৫ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলে। পানীয় জল, শৌচালয় নেই প্রায় ৬০ শতাংশ স্কুলে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষার অধিকার আইনে যে সব কথা বলা হয়েছে, যেমন, স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল, পাঠাগার তৈরি করা, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি — তা পূরণ করতে না পারলে বহু স্কুল উঠে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে কোনও নজর ছিল না পূর্বতন সরকারের। আশা করি বর্তমান সরকার এদিকে আরও নজর দেবে।

স্বাধীনতার ৬৩ বছর বাদেও ৫১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটিতেও কোনও অশিক্ষক কর্মী নেই। ফলে ঘণ্টা বাজানো, ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি পিওন, দারোয়ান, ঝাড়ুদারের যাবতীয় কাজ করতে হয় শিক্ষকদের। এই ৫১ হাজার বিদ্যালয়ে একজন করে অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ হলে ৫১ হাজার বেকার চাকরি পেত। দীর্ঘ ৩৫ বছরে সিপিএমের কানে এই কথা প্রবেশ করানো যায়নি।

শিক্ষার মানে একদা অগ্রগণ্য রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে এরা ক্রমশ পিছিয়ে নিয়ে চরম সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে পশ্চিমবাংলা শিক্ষার মানে প্রথম/দ্বিতীয় স্থানে বিরাজ করত। ১৯৭৭ সালে এরা যখন ক্ষমতায় আসে তখনও শিক্ষায় এ রাজ্যের স্থান ছিল নবম, যা ৩৪ বছরে ২৩তম স্থানে নেমে এসেছে, এ রাজ্যের মান মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষার অধিকার আইনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে সকলকে বাধ্যতামূলক প্রমোশন ও অষ্টম শ্রেণীর পাস সার্টিফিকেট দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা চালু করতে এরা উদ্যোগী হয়ে শিক্ষাকে সীমাহীন ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। আশা করি নতুন সরকার এই সর্বনাশা কেন্দ্রীয় শিক্ষার অধিকার আইন পরিত্যাগ করে শিক্ষাকে আরও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে উদ্যোগী হবেন।

এস ইউ সি আই (সি)-র দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবশেষে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরে এসেছে। এ জয় ঐতিহাসিক। তথাপি ইংরেজি শিক্ষা পশ্চিমবাংলায় আজও চরম অবহেলিত। সরকারি ইংরেজি বইগুলি আদৌ উপযুক্ত মানের নয়। পাশ-ফেল প্রথা না থাকা, বৃত্তি পরীক্ষা চালু না হওয়া ইত্যাদির ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল থেকে যাচ্ছে। ড্রপ আউট বাড়ছে হু হু করে। প্রায় ৫৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে — যা মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত প্রায় ৭০ শতাংশে দাঁড়াচ্ছে।

মিড-ডে মিলে খাদ্যের মান খুব খারাপ, পানীয় জলের অভাব এবং অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ এত কম যা দিয়ে বাস্তবে মিড-ডে মিল চলে না। এর সঙ্গে আছে দলবাজি। অথচ ঠিকমতো এই ব্যবস্থা চালু করা এবং কলকাতা সহ শহরাঞ্চলে যেখানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী এখনও মিড-ডে মিল পায় না, সেখানে শুকনো পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় সমস্যা বেড়েই চলেছে।

একইভাবে '৭৯ সালের পর সিলেবাস কমিটি পুনর্গঠিত না হওয়ায় সিলেবাস ও পাঠক্রম দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে চলেছে। মাঝে মধ্যে খেয়াল খুশিমতো কিছু বইয়ে সামান্য পরিবর্তন করে বিজ্ঞানসম্মত বলে দেখানোর চেষ্টা হলেও বাস্তবে তা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক নয়। এছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রহসনে পর্যবসিত করে বহির্মূল্যায়ন ও ড্যাট নামক যে বস্তু চালু করা হয়েছে, তাতে শিক্ষার মান আরও তলানির দিকে যাচ্ছে।

শিক্ষক জীবনের সমস্যা প্রবল। স্বাধীনতার ৬৩ বছর পরেও শিক্ষকরা মাস পয়লা বেতন পাননি। বার বার পূর্বতন সরকারের মন্ত্রীবর্গ ঘোষণা করার পরেও শিক্ষকদের বেতনের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ নেই। এমনকী গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকরা দু'মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর এক মাসের বেতন পাচ্ছিলেন। বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সদর্থক ঘোষণায় এখন থেকে মাস পয়লা বেতন চালু হয়েছে, যা শিক্ষক সমাজের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের নৈতিক জয়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। পেনশন কবে জুটবে কেউ জানে না। হাজার হাজার পেনশন ফাইল দপ্তরে জমে যাচ্ছে। জেলায় এবং সার্কেলেও শত শত পেনশন কেস জমে যাচ্ছে, টাকা নেই। ভাঁড়ার শূন্য করে দিয়েছে পূর্বতন সরকার। নতুন সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণায় বর্তমান শিক্ষকরা অবসরের ১ মাস পরে পেনশন পাবেন বলা হলেও বকেয়া হাজার হাজার কেস সম্পর্কে কোনও আশ্বাসবাণী এখনও শোনা যায়নি।

শিক্ষকদের পিএফ-এর কোটি কোটি টাকার কোনও হিসাব নেই। বহু ক্ষেত্রে টাকা লোপাট। জেলাগুলির প্রতি বছর শিক্ষকদের হিসাব দেওয়ার কথা, তা আদৌ দেওয়া হয় না। শিক্ষকদের গচ্ছিত টাকা নয়ছয় হয় পূর্বতন সরকারের আমলে। শিক্ষকদের ৮/১৬/২৫ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষ ইনক্রিমেন্ট প্রদানের দাবিটি আজও উপেক্ষিত, যা সরকারি কর্মচারীরা বহু বছর আগেই পেয়ে গেছেন।

সিপিএম সরকারের আমলে শিক্ষা প্রশাসন তথা সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রকে পর্যবসিত করা হয়েছিল দলবাজির ঘৃণ্য আখড়ায়। কমিটি দখল, প্রশাসক নিয়োগের পাশাপাশি সমগ্র শিক্ষা প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় রেখে যা খুশি তাই করা হচ্ছিল। স্কুল বাড়িগুলিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলীয় কার্যালয়ে পর্যবসিত করা হয়েছিল।

এরকম আর একটি নমুনা — জোর করে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা। শিক্ষকদের কাছ থেকে যখন তখন মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হত। প্রতিবাদ করলে তাঁদের নানা নির্যাতনের শিকার হতে হত। এমনকী বেতন বন্ধের ঘটনাও ঘটত।

নানা কটু বাক্যবাণে মাঝে মাঝে নেতা-মন্ত্রীরা শিক্ষকদের বিভূষিত করতেন। এই ছিল শিক্ষকদের প্রতি সিপিএম সরকারের শ্রদ্ধার নমুনা। শিক্ষকরা ফাঁকিবাজ, ক্লাসে বসে ঝিমোয়, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি বিশেষণের পাশাপাশি শিক্ষকদের গরু-ছাগলের সাথে তুলনা করাও বাদ যায়নি। আবার শিক্ষকদের প্রচুর বেতন বাড়িয়েছে সরকার, তারা এখন ক্লাবে যায়, মোটরগাড়ি কেনে ইত্যাদি প্রচারের সাথে সাথে এবার নির্বাচনের আগে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ভোটের কাজে তাদের হয়ে নামার জন্য শিক্ষকদের বলেছিলেন। যেন শিক্ষকরা তাঁদের হাতের পুতুল, আর বেতন যেন ওঁরা নিজেদের পকেট থেকে দিচ্ছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে চলা এই সমস্ত অব্যবস্থার অবসান নতুন সরকার করুক, এটাই শিক্ষক সমাজ ও রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও-র আন্দোলনের জয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে যোগা থেরাপিকে সেল্ফ ফিনান্সিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। যার ফলে বাৎসরিক কোর্স ফি ৯,৩০০ টাকা থেকে তিনগুণ বেড়ে ২৮,৭০০ টাকা হওয়ার কথা ছিল। এ আই ডি এস ও যোগা থেরাপির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। বিভাগীয় প্রধান এবং কলাবিভাগের ডিন ও উপাচার্যের কাছে বার বার বর্ধিত কোর্স ফি বাতিলের দাবি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে ২৯ জুন উপাচার্যের গাড়ি ঘেরাও করে বাড়তি ফি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। ছাত্র আন্দোলনের চাপে উপাচার্য শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের দাবি মেনে নেন। যোগা থেরাপিকে ডিপ্লোমা কোর্স থেকে ডিগ্রি কোর্স করার দাবি জানিয়েছে এ আই ডি এস ও।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন ফাঁস ঃ ডিএসও-র আন্দোলন

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি পার্টওয়ান জুলজি অনার্সের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ১ জুলাই। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাটি পরের দিন হবে বলে ঘোষণা করে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও কন্ট্রোলারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রশাসনিক ভবনের সামনে চলে দফায় দফায় বিক্ষোভ। কন্ট্রোলার প্রথমে দায় এড়ানোর চেষ্টা করলেও পরে দায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তদন্ত কমিটি গঠন করে ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ডিএসও-র জেলা সম্পাদক কমরেড ভীম মণ্ডল জানিয়েছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাস্তুঘুঘুর বাসা গড়ে উঠেছে, তারাই প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে, যার শিকার হতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। অবিলম্বে এদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি জানায় ডিএসও।

ডিএসও-র আন্দোলনে মেদিনীপুর কলেজে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার

মেদিনীপুর কলেজে স্ট্যাটিসটিক্স (অনার্স)-এ উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও ভর্তি ফি ১৪৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯৩৫ টাকা করার প্রতিবাদে এবং সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স বাতিলের দাবিতে ২৩ জুন দফায় দফায় মিছিল, স্লোগান, বিক্ষোভ, প্রিন্সিপাল ঘেরাও ইত্যাদি চলে। উপস্থিত ছাত্র-অভিভাবকরাও এই আন্দোলনে যোগ দেন। এআইডিএসও-র প্রতিনিধিদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষপর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষ বর্ধিত ফি-র পুরোটাই, অর্থাৎ ৫০০ টাকা কমানোর কথা ঘোষণা করেন। এছাড়া দিবা ও প্রাতঃকালীন বিভাগের আলাদা ক্যাশ কাউন্টারের দাবিও কর্তৃপক্ষ মেনে নেন।

কাকদ্বীপে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের জয়

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার, গ্রাহক স্বার্থবিরোধী এমভিসিএ বাতিল, জরাজীর্ণ তার-ট্রান্সফরমার পরিবর্তন ইত্যাদি দাবিতে অ্যাবেকার কাকদ্বীপ শাখার ডাকে ১ জুলাই জাতীয় সড়ক পার্শ্ববর্তী নেতাজি মূর্তির সামনে থেকে পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক মিছিল করে কাকদ্বীপ স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে যান।

সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত পড়িয়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্বকারী প্রতিনিধিরা স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাইরে বিক্ষোভ সভার কাজ চলতে থাকে। স্থানীয় দাবিগুলি পূরণের ক্ষেত্রে টালবাহানা করায় স্টেশন ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হয়। বিকাল ৫-৩০টা নাগাদ তিনি সকল দাবি নির্দিষ্ট সময় সীমার ভিত্তিতে মেনে নিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার পক্ষ থেকে গ্রামে-গ্রামে কমিটি গঠন করে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

সাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বের প্রশ্নটি জরুরি কেন

(৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে মহান নেতার শিক্ষা থেকে কিছু অংশ প্রকাশ করা হল।)

নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লেনিন পার্টি, পার্টি নেতৃত্ব ও অথরিটির ধারণাও সামনে নিয়ে এলেন। নেতৃত্বের প্রশ্নটি এত জরুরি কেন? সে কি শুধু পার্টিকে সুশৃঙ্খলায় চালাবার জন্য? না, শুধু তাই নয়। জনগণকে সক্রিয় ভূমিকায় টেনে আনার জন্যও নেতৃত্ব ও অথরিটি দরকার। কমিউনিস্ট পার্টির এই অথরিটির ধারণাকে ঘিরে যান্ত্রিকতা, আমলাতান্ত্রিকতা, ব্যক্তিপূজাবাদ ইত্যাদি নানা কথা এসেছে। আমরা এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। আমরা জানি, বাস্তব অবস্থার কারণেই পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের চেতনার স্তর, আর কর্মীদের, র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের চেতনার স্তরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে। এমনকী, ন্যূনতম যে চেতনার স্তরটা কর্মীদের থাকা দরকার, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে ফাঁক আছে। আবার, পার্টি কর্মীদের চেতনার স্তরের সাথে জনগণের চেতনার স্তরেরও অনেক ফারাক আছে। এই যে নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে চেতনার ন্যূনতম মানের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান, তা কি নেতৃত্ব চাইলেই কমিয়ে আনতে পারে? এটা কমিয়ে আনা একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটবে। যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ যেকোনও তত্ত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে এবং সেই অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্রে একটা যান্ত্রিকতা থাকবেই। কিন্তু থাকবে বলেই সে সম্পর্কে আমরা অসতর্ক থাকতে পারি না, তাকে বাড়তে দিতে পারি না। যান্ত্রিকতা যেটা আছে, সেটা বাস্তব সীমাবদ্ধতা। ফলে, তার চরিত্র আমাদের বুঝতে হবে এবং চেতনার মান বাড়াবার জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, আলাপ-আলোচনা-স্টাডি ক্লাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। এভাবে দেশের মধ্যে, গণআন্দোলনের মধ্যে, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মধ্যে একটা তর্ক-বিতর্কের, আলাপ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে চেতনার মানকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকশিত করার রাস্তা, যান্ত্রিকতাকে আটকাবার, তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বাস্তব পন্থা। যান্ত্রিকতার মনোভাব ও তার থেকে যে দোষগুলো বর্তায়, সেগুলো থেকে পার্টি কর্মীদের দূরে রাখবার এটাই হচ্ছে বাস্তব প্রক্রিয়া। কিন্তু তাই বলে আমরা চাইলেই কি সকলের স্ট্যান্ডার্ড (মান) সমান করে দিতে পারি? ওরকম ভাবাটা অবাস্তব। কোনও মার্কসবাদীই এভাবে চিন্তা করেনি। তত্ত্বোপলব্ধির ও তাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে চেতনার এই ব্যবধান, যান্ত্রিকতার এই সীমাবদ্ধতা থাকবেই। এইজন্যই আবার অথরিটির ধারণা একটা বাস্তব প্রয়োজন। এটা ছাড়া কোনও কাজ হতে পারে না, কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

তাই গণতন্ত্র, অধিকার এইসব বড় বড় কথার আড়ালে অথরিটিকে কোনওভাবে লঘু করার চেষ্টা হলে, তার অর্থ দাঁড়াবে বাস্তবে পার্টি নেতৃত্বের অবসান ঘটানো, পার্টি সংহতির অবসান ঘটানো, জনগণকে নেতৃত্বহীন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। অথরিটি বাদ দিলে মতাদর্শগত সংগ্রামকেও একটা খোলা ময়দানের তর্কাতর্কিতে পরিণত করা হবে, বিপ্লবী পার্টিকে একটা লক্ষ্যহীন বিতর্ক সভায় অধঃপতিত করা হবে। এ জিনিস কোনও দিন কোনও বিপ্লবী পার্টি চিন্তা করতে পারে না। ফলে, ব্যক্তিপূজা বা যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে অথরিটিকে হেয় করার, লঘু করার কোনও প্রবণতা বা চিন্তাকেই সমর্থন দূরের কথা, বিন্দুমাত্র লঘু করে দেখা চলে না। আমি যদি আমার কোনও আলোচনার ধরন, কোনও প্রশ্ন তোলার ধরনের দ্বারা পার্টি অথরিটিকে খাটো করে ফেলি, তবে তার দ্বারা আমি গুরুতর অন্যায় ও অপরাধ করব। কোনও বিপ্লবী পার্টি সেটা মেনে নিতে পারে না, মেনে নেওয়া উচিত নয়। এখানেই হচ্ছে সীমারেখা। পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কোনও বিষয়ে আলোচনার, তর্কাতর্কির ব্যাপক অধিকার পার্টি একজনকে দেবে। কিন্তু, এই ব্যাপক কথাটার মানে সব সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া নয়। সেখানে সীমাটা হচ্ছে, কেউ আলোচনার নামে অথরিটিকে খাটো করতে পারেন না। অথরিটি সম্পর্কে উপলব্ধিটা কোথাও যান্ত্রিক হচ্ছে মনে করলে, তা নিয়ে কেউ আলোচনা করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্নটা হবে সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ যে জায়গায় তিনি মনে করছেন, উপলব্ধিটা যান্ত্রিক হচ্ছে, তিনি সে জায়গাটা দেখিয়ে বলবেন, এই জায়গাটার উপলব্ধি যান্ত্রিক হচ্ছে, এখানে বিষয়টা সম্পর্কে বোঝা সঠিক হয়নি বলেই এটা হচ্ছে, বিষয়টা এভাবে বোঝা হলে যান্ত্রিক হত না। প্রশ্নের উত্থাপনাও এভাবে হবে, তবে তার দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনও উপকৃত হবে। কিন্তু প্রশ্ন ও আলোচনা যদি বড় কথার আড়ালেও এমনভাবে তোলা হয়, যার দ্বারা অথরিটি সম্পর্কেই প্রশ্ন এসে যেতে পারে, তবে তাতে কোনওমতেই সম্মতি দেওয়া যায় না। দিলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়, ক্রুশ্চেভের মতো শোধনবাদীদের হাতে পড়ে যেটা সাম্যবাদী আন্দোলনে হয়ে গেল। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে তারা স্ট্যালিনের অথরিটিকে খাটো করে দিল এবং তার পথ বেয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনে শোধনবাদের সিংহ দরজা খুলে দিল। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের মধ্য দিয়েই লেনিনবাদ সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উপলব্ধির রাস্তা পেয়েছিল। ক্রুশ্চেভরা সেটাকে ধ্বংস করে দিল। এর ফলে লেনিনের মূল সিদ্ধান্তগুলো যার যেমন খুশি ব্যাখ্যা করার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, পরিণামে আদর্শগত ক্ষেত্রে শোধনবাদ-সংস্কারবাদের অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দেওয়া হল। নাহলে, অনেক দেশেই কমিউনিস্টদের আত্মদান ছিল, সংগ্রাম ছিল, কাজকর্ম ছিল, অগ্রগতি ছিল। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর একটা বিরাট সময় ধরে কেবলই পিছনে হটে এল। অন্ধকার যুগ নেমে এল কমিউনিস্ট আন্দোলনে। ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে ক্রুশ্চেভরা সর্বনাশ করে দিল। ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা অত সোজা নয়। তার জন্য ব্যক্তিপূজাবাদের জন্ম নেওয়ার মূল কারণটা জানতে হয়। এসব কথা ক্রুশ্চেভরা চিন্তা করেনি। তারা স্ট্যালিনকে খাটো করার দ্বারা সাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটির সমগ্র ধারণাকেই ধ্বংস করে দিল। স্ট্যালিন নিছক একজন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন অথরিটি ধারণার মূর্তরূপ। স্ট্যালিন সম্পর্কে জনসাধারণের ভূমিকার প্রশ্নটা কীসের সঙ্গে জড়িত? স্ট্যালিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা গৌরবময় স্মৃতি। তাঁর নামের সঙ্গে, তাঁর মর্যাদার সঙ্গে, তাঁর অথরিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা ব্যাখ্যা, যা জানার জন্য মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে হলে স্ট্যালিনের দেখানো পথেই যেতে হবে, কোনও ধারণার ঠিক-বেঠিক বিচার স্ট্যালিনের দেওয়া মানদণ্ডেই করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষের ও কমিউনিস্টদের এই মানসিকতাকেই ধ্বংস করে দেওয়া হল স্ট্যালিনকে মসীলিপ্ত করে, তার অথরিটিকে বিলুপ্ত করার মধ্য দিয়ে।

সাম্যবাদী আন্দোলনে এই অথরিটির ধারণাও লেনিনীয় পার্টি তত্ত্বেরই ধারণা। এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা যদি পার্টির মধ্যে না থাকে, তা গোলগোল ভাষায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে নেতৃত্ব কথাটার কোনও মানে নেই। স্ট্যালিনের এ বিষয়ে আলোচনা আছে। ট্রটস্কির সঙ্গে আলোচনায় স্ট্যালিন এই নেতৃত্ব বা অথরিটির ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্বের ধারণাটা ভাসাভাসা নয়, বিমূর্ত নয়, সেটা সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব। তা না হলে নেতৃত্ব কথাটার কোনও অর্থই নেই। এ বিষয়ে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট পার্টি এ পর্যন্তই বলেছে, বিষয়টাকে আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে তত্ত্বগতভাবে কিছু করে যাননি তাঁরা। আমাদের পার্টি এ জিনিসটা করেছে। এখানে আমরা ভুল করিনি। নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট ধারণাকে তত্ত্বগতভাবে দাঁড় করানোর দ্বারা আমরা পার্টিকে উগ্র গণতন্ত্র, বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, শোধনবাদ-সংস্কারবাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, যাতে বিশ্বের অনেক পার্টির যে পরিণতি হয়েছে, আমাদের দেশে সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর যা হয়েছে, তা আমাদের যাতে না হয়।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবী পার্টির গঠন প্রভৃতির ধারণাটা বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ, বা কিছু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিরূপণের মধ্যেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয়। এটা সমসাময়িক বিশ্বের ও বিশেষ সমাজের পটভূমিতে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাকে সংযোজিত করে একটা সামগ্রিক জ্ঞানের ধারণা। দল যতক্ষণ এই সামগ্রিক জ্ঞানের ধারণার অধিকারী না হয়, ততক্ষণ দল সত্যিকারের বিপ্লবী তত্ত্বের সন্ধানই পায় না, তা সে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে যত ঠিক কথাই বলুক, আর, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বই থেকে উদ্ধৃতি যতই দিতে পারুক। যে দেশের বিপ্লবী পার্টি নিজেদের শক্তিতে বিপ্লব করেছে, অর্থাৎ অপরের সহায়তায় বিপ্লবের কাজটা সফল হয়ে গেছে তা নয়, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার জ্ঞানকে সংযোজিত করে সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী বিপ্লবী দলকে হতে হয়েছে, তার ভিত্তিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে পথনির্দেশ দিতে হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটো মডেল আমাদের সামনে আছে। একটা লেনিনের সময়ে সোভিয়েট পার্টি করেছিল। তারা সক্ষম হয়েছিল। চীনে মাও সে-তুঙের পার্টিও, লেনিনের দেওয়া জ্ঞানের সঙ্গে, চীনের সমাজের মধ্য থেকে আহরিত জ্ঞান তাদের যা ছিল, তার সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয় ঘটিয়েছে। কিন্তু সেটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরলে ভুল ধরা হবে। আজ আবার যেসব সমস্যার সম্মুখীন তারা হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলো সে সম্পর্কে যা বলছে, সেগুলোকে যদি সংযোজিত করে তারা তাদের জ্ঞানকে আরও পরিবর্ধিত করতে না পারে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ নতুন রূপে যে সমস্যার সৃষ্টি করবে, তার মোকাবিলা তারা করতে পারবে না। আর্থিক অগ্রগতি, কারিগরি অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি — এসব সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবাদের সমস্যার মীমাংসা এখনও হয়নি, ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কী কী প্রশ্নের সম্মুখীন, কীভাবে তাকে সমাধান করতে হবে, তার মীমাংসা হয়নি। বিপ্লবের আগে এই ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে যেসব প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলোকে যেসব কথা বলে মীমাংসা করা গেছে, বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থায় সেই একই কথা বলে তার মীমাংসা করা যাবে, নাকি তা সমস্যা সৃষ্টি করবে — এসব ভাবা হয়নি। ফলে, নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রামটি কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, যথার্থ ব্যক্তি স্বাধীনতার উপলব্ধি কী হবে, এই তত্ত্বের সন্ধান যদি তারা সঠিকভাবে দিতে না পারে, তাহলে সমস্যা হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই ব্যক্তিবাদ চরিত্রের দিক থেকে মূলত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ হলেও, বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার ধরনধারণ ঠিক বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের মতো নয়। এই দুটোর আলাদা প্রকৃতি দেখাতে গিয়ে আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবাদের যে রূপ, তাকে 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলেছি। মনে রাখা দরকার, সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ খতম হয়নি। ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম যেটা বুর্জোয়ারা শুরু করেছিল, তার মীমাংসা হয়নি। ব্যক্তির স্বাধীনতার নামে যেটা অর্জিত হয়েছে, সেটা বুর্জোয়া অর্থে ব্যক্তির সমানাধিকার, অর্থাৎ সমাজে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ পাবে যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী। সেই সুযোগকে কেউ বন্ধ করবে না। কিন্তু, ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্ন, যার জন্য ব্যক্তি লড়াই শুরু করেছিল, সেটার মীমাংসা হয়নি। ফলে, প্রশ্ন বার বার আসবেই যে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা হচ্ছে। সোভিয়েটে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এতদিন বাদেও সোভিয়েট সমাজে এই প্রশ্ন এসেছে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শোধনবাদের জন্য এ জিনিস এসেছে, তা নয়। এটা আসতই। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা হচ্ছে — আমি যেমনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে চাই, তেমনভাবে আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ বাস্তবেই দিতে পারে না। কারণ, এর সুযোগে নানা প্রতিবিপ্লবী ভাবধারা মাথাচাড়া দেয়। ফলে, তা না দিয়ে ঠিকই করা হয়। কিন্তু তার দ্বারা যে ব্যক্তির যথার্থ স্বাধীনতা ও স্বার্থকে খর্ব করা হয় না এবং কেন করা হয় না, কীভাবে করা হয় না, তা তো বুঝিয়ে দিতে হবে।

এইটে দেখাতে গেলে দেখাতে হবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তির রাস্তা ঐতিহাসিকভাবে যথার্থই কোথায় নিহিত এবং কীভাবে নিহিত। দেখাতে হবে, কেন সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে কিছু লড়াই করার নেই। এখানে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রকৃতি কী, এবং সেই দ্বন্দ্বকে কীভাবে নিরসন করতে হবে, তা দেখাতে হবে। এইসব প্রশ্নের বাস্তব তত্ত্বটা গড়ে না তুলতে পারলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক অগ্রযাত্রার পরিপূরক সামাজিক মানসিকতাটা গড়ে উঠবে কীভাবে? সোভিয়েট ও চীনের পত্রপত্রিকা পড়ে আমরা এইসব প্রশ্নের আলোচনার কোনও সন্ধান পাইনি। এজন্যই আমরা বলছি যে, লেনিনের সময় বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় আহরিত সত্যকে যেভাবে সংযোজিত করেছিল, লেনিনের মৃত্যুর পর সে জায়গায় ঘাটতি হয়েছে। দর্শন, বিজ্ঞান সমস্ত ক্ষেত্রে যেসব নিত্যনতুন প্রশ্ন এসেছে, সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে সেগুলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক জ্ঞানে উন্নীত করা হয়নি।

অনেকে মনে করেন, এগুলোর দরকার নেই। এসব না হলেও চলবে। আমি তা মনে করি না।

পাঁচের পাতায় দেখুন

সাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটির ধারণা

চারের পাতার পর

নাহলে শুধু কি বিজ্ঞতা জাহির করার জন্যই লেনিনের 'মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড ইমপিরিও ক্রিটিসিজম' বইটা লেখার দরকার হয়েছিল? আমি মনে করি, ইনটেলেকচুয়াল লেভেল-এ, অর্থাৎ জ্ঞানজগতের সমস্ত ক্ষেত্রে বিপ্লব যদি প্রতিক্রিয়াবাদীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে না পারে, তাহলে মাঠে-ময়দানে লড়ালড়ির যে আয়োজনটা হয়, সেটা বেশিদূর এগোতে পারে না, তা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। একটা সামরিক লড়াই, একটা সশস্ত্র যুদ্ধ জয় করা মানেই তো বিপ্লব নয়। বিপ্লব হচ্ছে, সমাজের দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে সমাজের ধারাবাহিক অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখা। এই কাজটা সর্বাত্মকভাবে না করতে পারলে, সেই বিপ্লব এগোতে পারে না। তাই পূর্ব ইউরোপের বিপ্লব অপরের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতা দখল করার পরে আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। একই কান্ড ভিয়েতনামের মাটিতেও হতে পারে। আজ ভিয়েতনামের মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কী বিরাট লড়াই করছে, কী বিশাল নৈতিক বলের পরিচয় তারা দিচ্ছে। ইতিহাসের একটা শিক্ষণীয় সংগ্রাম তারা দেখিয়ে দিল। কিন্তু, আমি জানি না, তারা তত্ত্বগতভাবে কতটা কী করেছে। হয়তো তাদের সেটা রয়েছে। কিন্তু যদি এরকম হয় যে, তত্ত্বের এই সন্নিবেশ তাদের হয়নি, তারা শুধু স্বাধীনতার লড়াই করে যাচ্ছে, তবে পরে তাদের সমস্যা খুবই কঠিন হবে। যেমন, চীনের বিপ্লবটা পরে খুবই কঠিন হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতার আবেদনটা সকলেই বোঝে, সহজে সাড়াও দেয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের কাছেও যদি সামগ্রিক বোঝাবুঝিটা এই পর্যন্তই ভাল থাকে, তারপর সব যে যার মতন বোঝা হয়, তবে হাজার প্রাণ দিলেও সেই বিপ্লব শেষপর্যন্ত এগোবে না। লেনিনও বলে গেছেন কথাটা। লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করেই মাও সে-তুঙও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এসে বলেছেন, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিপ্লবে শত্রুকে সরাসরি চেনা যায়, মানুষকে অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝানো যায় — কারা শত্রু, কাদের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপারটা অনেক জটিল হয়ে যায়। কারণ, সেখানে শত্রু থাকে নিজের মধ্যে — পুরনো বুর্জোয়া সমাজের নানা প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা ও বুর্জোয়া চিন্তা-সংস্কৃতির যে প্রভাব মানুষের মধ্যে থেকে যায়, তার মধ্যে। সেখানে মানুষকে কী করতে হবে বোঝাতে গেলে, মানুষের মধ্য থেকেই বাধা আসে। এই বিপ্লব অনেক জটিল। আজ নভেম্বর বিপ্লবকে আমাদের দেশে স্মরণ করার প্রাথমিক কর্তব্য এই জায়গায়। লেনিনবাদের যে মূল সিদ্ধান্ত, যে বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির কথা আমি বললাম, সেগুলো আপনারা সামনে রাখবেন। নভেম্বর বিপ্লবের আরও অনেক শিক্ষা আছে — যার সমস্ত দিক একটা সভায় আলোচনা করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া, আমি একটা অন্য ধারায় আলোচনা করেছি। আমি যেটা পরিষ্কার করে বলতে চেয়েছি, তাহল, লেনিনবাদী বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করুন, শুধু লেনিনের কথাগুলো নয়। পন্ডিতসমাজ শুধু লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে যখন জ্ঞান-বিদ্যা জাহির করার চেষ্টা করবে, তখন তার মধ্যে আপনারা খোঁজ করে দেখবেন — এটা আমি আমাদের পার্টির কর্মী-নেতা সকলের জন্যই বলছি — লেনিন ঐ কথাগুলো বলবার পিছনে যে বিচারপদ্ধতিটা অনুসরণ করেছেন, সেটা তাঁরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন কি না। এবং তা করতে পেরে থাকলে, যেমন করে কথাগুলো বলবার কথা, এঁরা তেমনভাবে বলছেন কি না। এইটাই হচ্ছে মূল জিনিস। এইটা পেলে লেনিনবাদকে পাওয়া গেল, এইটা পেলে আমরা লেনিনবাদকে আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করবার যোগ্যতা অর্জন করব। এটা শুধু নেতারা আয়ত্ত করলে হবে না। সমস্ত কর্মীরাও যদি তা আয়ত্ত করতে না পারেন, অন্তত একটা ভাল অংশ যদি আয়ত্ত করতে না পারেন, অর্থাৎ দলগতভাবে আমরা আয়ত্ত করতে না পারি, তবে কিন্তু আমাদের কাজ অনেক শ্লথ গতিতে এগোবে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চরিত্র থাকা সত্ত্বেও, মূল বিশ্লেষণ, মূল নীতি ঠিক থাকা সত্ত্বেও, এই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও যে গতিবেগ আমরা সৃষ্টি করতে পারতাম, তা আমরা পারব না। কর্মীদের সাংগঠনিক ক্ষমতায় ঘাটতি দেখা দেবে।

আর, পার্টি গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে পার্টি যে চিন্তাগুলোকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তা হিসাবে বিশদ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত করেছে, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। সেটা হচ্ছে, যৌথ নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট ধারণাটি গড়ে তোলার সংগ্রামই হচ্ছে এক অর্থে সঠিক পার্টি গড়ে তোলবার সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এই শর্তটা যুক্ত করেছি। 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইয়ে এই বিষয়টা আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এটা নিজেদের একটা সুবিধার জন্য করা হয়নি। একটা তত্ত্ব হিসাবে এটাকে উন্নীত করার চেষ্টা হয়েছে লেনিনবাদকে ইলাবরেট করার (বিশদ ব্যাখ্যার) দ্বারা।

এগুলো পার্টির নেতা-কর্মীদের বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। যদি কোনও কমরেডের বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে কখনই নিজস্ব মনগড়া বা উল্টোপাল্টা ধারণা দিয়ে বিরুদ্ধতা করতে যাবেন না। পার্টির যেকোনও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই আগে বোঝবার চেষ্টা করবেন। বারবার বোঝার চেষ্টা করে যদি দেখেন যে, বিষয়টা ঠিক বলা হচ্ছে না, এর মধ্যে ত্রুটি আছে, তখন তত্ত্বগতভাবে ভুলটা ধরিয়ে দিন। তার দ্বারা দলও উপকৃত হবে, যদি দলটা তখনও সঠিক থাকে। শুরুতেই 'এটা ঠিক না' বলে উল্টো দিক থেকে শুরু করা শেখবার সঠিক উপায় নয়। এভাবে কেউ কিছু শিখতেও পারে না। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে শেখার মধ্যে 'হ্যাঁ' ও 'না' দুটোই নিহিত থাকে। ঠিক ঠিক শিখতে চাইছি মানেই ঠিক ঠিক দ্বন্দ্ব হচ্ছে। এ না করে যদি প্রথমেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস দিয়ে কেউ শুরু করেন, তাহলে তিনি কী করে শিখবেন? এভাবে শুরু করার অর্থ তিনি অথরিটিকেই, জেনে হোক, না-জেনে হোক, অস্বীকার করছেন। এই মানসিকতা থেকে যদি কেউ মুখে বলেনও যে, তিনি শিখতেই চাইছেন, তবে সেটাও হবে মুখের কথা মাত্র। আসলে তিনি শিখতে চাইছেন না। যথার্থই বুঝতে চাইলে তার মানসিকতাটা হবে অন্যরকম।

যদি ধরুন, কারোর কোনও বিষয়ে সংশয়ও থাকে — যিনি বোঝার স্তরে আছেন, তাঁর এরকম সংশয় থাকতেই পারে — সেরকম ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আগে বোঝবার চেষ্টা করুন, আগেই নিজেকে সব কিছু জেনে ফেলেছেন ভেবে নেবেন না। মনে রাখবেন, অথরিটি না মেনে একজন কোনও কিছু শিখতে পারে না। এবং সেই অথরিটি অবশ্যই নিজের দলের মধ্যকার অথরিটি, বাইরের কেউ নয়। লেনিন প্রথমে প্লেখানভের ছাত্র ছিলেন, প্লেখানভের কাছ থেকেই তিনি শিখতে গিয়েছিলেন। তা শিখতে গিয়ে কি তিনি, আপনি কী বোঝেন, এটা ঠিক না, ওটা ঠিক না — বলে আরম্ভ করেছেন? না, যথার্থ কোনও ছাত্রই তার শিক্ষকের কাছে গিয়ে এভাবে শুরু করে না। লেনিন ছাত্রের মন নিয়েই, শেখবার মন নিয়েই প্লেখানভের কাছে গেছেন। তারপর শিখতে শিখতে প্লেখানভের সীমাবদ্ধতা তাঁর চোখে পড়েছে। আমরাও অনুশীলন সমিতিতে ছিলাম। সেখানে যেসব নেতাদের দ্বারা আমাদের মার্কসবাদে হাতেখড়ি হয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে শিখতে শিখতেই তাঁদের সীমাবদ্ধতা আমাদের চোখে পড়েছে, আমরা তাঁদের ছেড়ে এসেছি। এটাই হচ্ছে ডায়ালেকটিকস। সত্যিকারের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তর্কবিতর্কের মানে যাঁরা বোঝেন তাঁরাই জানেন, যেকোনও রকম তর্কাতর্কি মানেই মতের বা যুক্তির দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষ নয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তর্কাতর্কির একটা প্রধান শর্ত হচ্ছে, সেটা সচেতন এবং তর্কাতর্কিতে যাঁরা লিপ্ত, তাঁরা সকলেই একটা অথরিটির ধারণা এবং মূল নীতিগুলোর সঠিক উপলব্ধির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এভাবে কেউ না বুঝলে, তিনি শুধু নিজের ব্যক্তিগত ধারণার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধতাকেই বাড়াতে থাকবেন।

অথরিটির ধারণা ও মূল নীতিগুলোর সঠিক উপলব্ধি — এই কাঠামোর মধ্যেই পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র জীবন্ত রাখা ও কর্মীদের চেতনার মান উন্নত করার বিষয়। তর্কাতর্কিতে বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যেকোনও প্রশ্নের উপর আলোচনা করার অধিকার দিতে পারলে পার্টিরই ভাল। এই 'যেকোনও' কথাটারও একটা সীমা আছে ও একটা পদ্ধতি আছে। আমার এই 'যেকোনও' কথাটার থেকে ধরে নেবেন না যে, যেকোনও প্রশ্ন, যেকোনও ফোরামে, যেকোনও সময়ে বিনা মতামতে আমরা তুলতে পারি। তা নয়। আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, যতটা ব্যাপক গন্ডি ধরে নানা ফোরামে নানা প্রশ্ন আলোচনা করা, মতামতের সংঘর্ষ করা যায়, তা করা দরকার। যেমন, একটা বিশেষ স্লোগান নিয়ে, একটা নীতি, কর্মসূচি বা কৌশল নিয়ে, কারও সঙ্গে ঐক্য করা না-করা নিয়ে একটা মতের বিরুদ্ধে আর একটা মতের তর্কবিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু, মূল নীতিতে বিরুদ্ধতা করলে আর সেটা আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম থাকে না। সেই সংগ্রামটা পার্টির সঙ্গে পার্টির বাইরের লোকের সংগ্রাম হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, মূল নীতি নিয়ে বিরোধিতা হয় না। মূল নীতি বোঝবার জন্য, আরও ভাল করে বোঝবার জন্য, যদি কারও বোঝায় গন্ডগোল থাকে, তা দেখাবার জন্য আলোচনা হতে পারে। কিন্তু মূল নীতিগুলোই ঠিক কি না — এই প্রশ্ন করা যায় না। কারণ, তার অর্থ দাঁড়ায়, যে মূল নীতির উপর পার্টি দাঁড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করা। এ চলে না। এ হয়তো না বুঝে অনেক কমরেড করেন। তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে, এর দ্বারা না চাইলেও, পার্টি অথরিটিকে খাটো করা হয়। এর ফলে আর পার্টির কিছু থাকে না। এ কোনও বিপ্লবী পার্টি মেনে নিতে পারে না। পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের যত ব্যাপক পরিবেশই থাকুক, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এ সম্পূর্ণ অন্য জাতের জিনিস। এ চলতে পারে না। এ সম্বন্ধে সমস্ত কমরেডদেরই সচেতন থাকা দরকার। নাহলে পার্টিতে মার্কসবাদের নামে উগ্র গণতন্ত্র ও ব্যক্তিবাদ কায়েম হবে। আর, গণতন্ত্র বলতে যা থাকবে, তা হবে নেহাতই একটা নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ফলে, সেই অবস্থায় পার্টি একটা ব্যুরোক্রেটিক পার্টিতে অধঃপতিত হবে। ব্যুরোক্রেসি আটকাবার জন্যই, অন্ধতাকে রোখবার জন্যই, অথরিটি দরকার। অথরিটিকে মেনে চলার দ্বারা অন্ধতা বাড়ে না, অন্ধতা বাড়ে চেতনার নিম্নমানের জন্য। অথরিটিকে মানবার কথা বারবার বলার দ্বারা অন্ধতা আসে না, অন্ধতা আসে তাকে ঠিকমত না বুঝে বলার দ্বারা। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থ হচ্ছে, ঠিকমতো বুঝে বলছে কি না সেটা দেখা ও ভুল বুঝে বলে থাকলে ঠিকটা কী হবে তা ধরিয়ে দেওয়া।

— নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড)

মূল্যবৃদ্ধির জন্য বাড়তি ব্যয়

একের পাতার পর

আর্থিক বছরে তাদের এই অতিরিক্ত খরচের পরিমাণ ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকা ঐ বছরে খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি ও সারের পিছনে সরকার ভর্তুকি হিসাবে যে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে, তার ৩৫ শতাংশ বেশি।

কোন কোন জিনিসের ক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি? দেখা যাচ্ছে, যে ৩১৬টি জিনিসের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, তাদের মধ্যে ৩৬টিই বিবিধ খাদ্যসামগ্রী এবং ১৪টি জ্বালানি। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ডিম ও দুধের দাম বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের দামও এই সময়ে ২৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া নানাপ্রকার ফল, চাল, ডাল, আনাজপাতির দামও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে।

এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারা? উচ্চবিত্তদের কথা বাদই দেওয়া যাক। তাদের আয়ের অনুপাতে নিত্যকার বাজারের এই মূল্যবৃদ্ধি ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। মধ্যবিত্ত বড় চাকুরিজীবীদেরও আয় এই ক'বছরে বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া জনগণের এই অংশ তাদের আয়ের একটা অংশমাত্র খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানির পিছনে খরচ করে। সমীক্ষানুযায়ী তাদের আয়ের বড় অংশ খরচ হয় নানাপ্রকার ভোগ্যসামগ্রীর পিছনে। এই জাতীয় দ্রব্যের দাম গত ৩ বছরে তেমন বৃদ্ধি পায়নি, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে খানিকটা কমেওছে। কিন্তু গরিব মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই অন্যরকম। তাদের আয়ের বেশির ভাগটাই খরচ হয় খাবার ও জ্বালানির পিছনেই। ফলে এইসব জিনিসের দাম বাড়ার অর্থ তাদের উপরে প্রবল চাপ বৃদ্ধি পাওয়া। হয়ও ঠিক তাই। ডালের দাম বেড়ে গেলে তাদের ডাল খাওয়া কমিয়ে দিতে হয়। পেঁয়াজের দাম বাড়লে পেঁয়াজ। তাদের খাবারের তালিকা থেকে বাদ পড়ে দুধ, ডিম, মাছ। অর্থাৎ এই মূল্যবৃদ্ধি তথা মুদ্রাস্ফীতি সরাসরি তাদের পেটে টান মারে। একমাত্র ঐ একটি জায়গাই তারা সংসারের বাজেট ছাঁটাই করতে পারে। আধপেটা খেয়ে তাদের দিন কাটাতে হয়। এ পথেই আসে অপুষ্টি, নানা রোগের আক্রমণ।

এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ভূমিকা পালন করছে? কোনও জিনিসের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকলে সেই 'চাহিদা অনুযায়ী জোগান কমে'র তত্ত্ব আউড়েই সরকার হাত ধুয়ে ফেলে। মূল্যবৃদ্ধি ও কর্মহীনতার চাপে দেশের কোটি কোটি গরিব মানুষের যখন এমন দুঃসহ অবস্থা, সরকার ও শিল্পপতিরা তখন 'উন্নয়ন'-এর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তারস্বরে। এমনও বলা হচ্ছে যে, উন্নয়নের গতি বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যবৃদ্ধি হবে, তবে তাতে চিন্তার কিছু নেই, ওসব ঠিক হয়ে যাবে। ধনীদের বা বিত্তশালীদের অবশ্যই চিন্তার কিছু নেই, তারা এনিয়ে ভাবেও না, কিন্তু দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের কী হবে? তারা কী করে খেয়েপরে বাঁচতে পারবে? এই সমীক্ষা আর একটা কঠিন সত্যকেও সামনে এনে দেয় যে, 'উন্নয়ন উন্নয়ন' বলে যে জিনিস আমাদের দেশে চলছে, তা দেশের অধিকাংশ মানুষের উন্নয়ন নয়। মুষ্টিমেয় ধনীর উন্নয়ন (সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৯-৬-১১)।

গণদাবীর

গ্রাহক হোন

ও

গ্রাহকরা নবীকরণ

করুন

বার্ষিক চাঁদা ঃ ১০৪ টাকা

সডাক ঃ ১১৭ টাকা

ষাণ্মাসিক চাঁদা ঃ ৫২ টাকা

সডাক ঃ ৫৯ টাকা

ডি ওয়াই ও-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিপ্লবী যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৬ জুন থেকে এক সপ্তাহব্যাপী জেলায় জেলায় যুব সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরে ঐতিহ্যমণ্ডিত 'রূপ-অরূপ' হলে এক সুশৃঙ্খল যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির ইনচার্জ ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আনসার সেখ। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জয় মণ্ডল। রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ যুবজীবনের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী বলেন, আমাদের দেশ এবং রাজ্য ভয়ঙ্কর সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে। পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য পরিণতিতে কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, নতুন নতুন কলকারখানা সেই অনুপাতে হচ্ছে না, বেকাররা কাজ পাচ্ছে না, যার ফলে বেকারত্ব তীব্র রূপ নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া যুব জীবনের সমস্যা সমাধানের কোনও রাস্তা নেই। সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

২৬ জুন এ আই ডি ওয়াই ও-র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, সদস্য সংগ্রহ অভিযান, ঘরোয়া বৈঠক, রক্তদান শিবির, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, হাসপাতাল সাফাই অভিযান, রোগীদের ফল মিষ্টি বিতরণ সহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি রূপায়িত হয়। এই কর্মসূচিগুলিতে প্রায় ৪০০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। ২৭ জুন বেলদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডি ওয়াই ও-র সদস্যরা সাফাই অভিযান ও রোগীদের ফলমূল বিতরণ করেন। ৩ জুলাই নারায়ণগড় ১নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে ৪২ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন।

কলকাতা

২৬ জুন এ আই ডি ওয়াই ও-র ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসে তিন শতাধিক যুবক-যুবতীর উপস্থিতিতে কলকাতা জেলা যুব সভা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হয়। এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ সহ জেলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর

২৬ জুন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে সমস্ত বেকারের কাজ, শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন, দীঘা-হাওড়া ও হলদিয়া-হাওড়া লাইনে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে এবং মদ-জুয়া-সাট্টা-অনলাইন লটারি, অপসংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২ জুলাই তমলুক মহেন্দ্র স্মৃতি সদন-এ একটি যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাসুদেব সামন্তের সভাপতিত্বে পরিচালিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা

ঘাটশিলায় যুব শিবির

অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির যৌথ উদ্যোগে ৩০ জুন থেকে ৩ জুলাই বিহারের ঘাটশিলায় মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষ শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল যুবশিবির। শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। প্রায় ২০০ জন যুব প্রতিনিধি শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। তীব্র বেকার সমস্যা ও শোষণে জর্জরিত এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবী যুবকর্মীদের ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে কমরেড মানিক মুখার্জী বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক, সহসভাপতি কমরেড দীপক কুমার, কোষাধ্যক্ষ কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামাণিক এবং কাউন্সিল সদস্য কমরেডস ইন্দ্রদেও রায়, রবিশংকর মৌর্য, মনোজ কুমার, স্বরূপ কুমার, জ্যোতি কুমার প্রমুখ।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাণঘাতী দূষণ প্রতিরোধের দাবিতে মন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট ভয়াবহ দূষণ প্রতিরোধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ৪ জুলাই কেটিপিএস পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি, কৃষক সংগ্রাম পরিষদ ও শান্তিপুর দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী এবং এলাকার বিধায়ক তথা জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর নিকট মহাকরণে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনির মুখে অত্যাধুনিক ইএসপি মেশিন বসানো, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্চমানের কয়লা ব্যবহার, কয়লা আনার জন্য ব্যবহৃত ওয়াগানে করে শূন্য কয়লা খনিগুলিতে পরিত্যক্ত ছাই ফেরত পাঠানো, অ্যাশপন্ডে ফেলা ছাই ও তেল মিশ্রিত জল পরিপূর্ণভাবে পরিশ্রুত করে খালে বা নদীতে ফেলা, জনবসতিপূর্ণ শান্তিপুর এলাকার ছাই গোডাউন অবিলম্বে বন্ধ করা, পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ, মেছেদায় একটি জলাধার, শিশু উদ্যান, ভ্যাট নির্মাণ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১০ কিমির মধ্যে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কেটিপিএস পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে অধ্যাপক জয়মোহন পাল, নিত্যানন্দ মণ্ডল, কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে শচীনন্দন খাটুয়া, শান্তিপুর দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে শ্যামচরণ মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, জগন্নাথ মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মন্ত্রী মহোদয়গণ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

পাথরপ্রতিমায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির দাবি জানাল জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৩টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে। লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি। এই দুর্গম জনবহুল অঞ্চলে মানুষের চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই।

স্থানীয় বিপিএইচসি-র সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বিনামূল্যে সাপে কাটা ও কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং উন্নত মানের ওষুধ সরবরাহ, বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স ও জলযানে সর্বক্ষণ রোগী পরিবহনের জন্য ব্যবস্থা রাখা, সমস্ত শূন্যপদে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ সহ সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরি এবং ব্লকের জনসংখ্যার নিরিখে আরও দু'টি বিপিএইচসি, সাতটি পিএইচসি ও ৩৭টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবিতে ৪ জুলাই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পাথরপ্রতিমা ব্লক কমিটি ও ঐ ব্লকের কয়েকটি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এছাড়া 'আশা' কর্মীদের উপযুক্ত ট্রেনিং ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতা বৃদ্ধির দাবি তোলা হয়।

সাধারণ মানুষ ব্লক অফিসের সামনের রাস্তায় বেলা ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত অবস্থান করেন। পরে ৩ শতাধিক মানুষ মিছিল করে বিডিও অফিসের সামনে গেলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ সজল বিশ্বাস ও জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক পুষ্প পালের উপস্থিতিতে ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে সুনন্দা পণ্ডা, বকুল হালদার, অভিরাম পুরকায়েত, প্রভাত দাস, নান্টু বর্মন, অজিত দাস এবং আশা কর্মীদের পক্ষে কাঞ্চন মাইতি ও গ্রামীণ ডাক্তারদের পক্ষে হিমাংশু গরাই সহ মোট ১৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিডিও-র সাথে আলোচনায় বসেন। দাবি সংবলিত স্মারকলিপিটি ৭ দিনের মধ্যে এম এল এ, বিডিও, ব্লক সভাপতি ও বিএমওএইচ যৌথভাবে স্বাক্ষর করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর প্রতিনিধিরা ফিরে আসেন।

যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানাল এস ইউ সি আই (সি)

একের পাতার পর

অভিযানের দ্বারা বাস্তবে সুযোগসন্ধানী লুঠেরাদের স্বার্থে বেপরোয়া হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের মাধ্যমে জঙ্গলমহলের নিরীহ অধিবাসীদের কার্যত ক্রীতদাসের মতো পদানত করে রাখা হবে। তাই এই অভিযানের যৌক্তিকতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই নির্বাচনের আয়োজনের সময় থেকে নতুন সরকারের এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত জঙ্গলমহলে যে শান্ত পরিবেশ রচিত হয়েছিল তাকে অশান্ত রাখার সুচতুর পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে। ধনকুবের দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে আবার নারকীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উদ্দেশ্যে অভিযানের এই সিদ্ধান্তকে আমরা চরম জনবিরোধী মনে করি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

হীন স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সত্যিই জঙ্গলমহলকে শান্ত করতে চায় এবং যদি রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে চায়, তবে প্রথমেই যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু চিদম্বরম ঘোষিত এই সিদ্ধান্ত নবগঠিত রাজ্য সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিরও সম্পূর্ণ বিরোধী। বাস্তবে নির্বাচনের পরেই তথাকথিত মাওবাদীদের অনুপস্থিতি প্রমাণ করেছে যে, সিপিএমই তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দলীয় সশস্ত্র ক্রিমিনালদের 'মাওবাদী' লেবেল লাগিয়ে খুন, ধর্ষণ, লুঠতরাজ চালাত, যা আমাদের দল গত তিন বছর ধরে বলে এসেছে। এখন কোনও সমস্যা থাকলেও রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী দিয়েই তার মোকাবিলা করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। আর যদি মাওবাদী সংগঠনের নগণ্য সংখ্যক প্রকৃত কর্মী এখন আবার এলাকায় এসেও থাকে এবং সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তবে রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই সে সমস্যার মীমাংসা সম্ভব, যে কথা নির্বাচনের পূর্বে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন। একই সাথে আমরা মনে করি, ছত্রধর মাহাতো সহ জঙ্গলমহলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিয়ে তাঁদের সঙ্গে অমীমাংসিত ও অসম্পূর্ণ আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এবং তা অবশ্যই করতে হবে। এই পথ গ্রহণ না করে জঙ্গলমহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী রেখে দিলে সমস্যাকে জটিলতর ও দীর্ঘস্থায়ী করা হবে। নবগঠিত সরকারের কাছে তাই অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার করে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।"

পানীয় জলের জন্যও দাম দিতে হবে

দিল্লির কংগ্রেস সরকারের ফরমান

কংগ্রেস পরিচালিত দিল্লি রাজ্য সরকার জলসম্পদ বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। জল সরবরাহ ব্যবস্থায় সরকারি ভরতুকি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জলকর বসানো হচ্ছে। সরকার এতে সফল হলে সাধারণ গরিব মানুষ রাস্তার ধারে সর্বসাধারণের জন্য বসানো ট্যাপের জল আর পাবেন না। ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যাতে জল নিয়ে ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করতে পারে, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত সরকার জলের উপর ট্যাক্স বসাতে উদ্যোগ নিয়েছে এবং জলসম্পদ বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পথে অনেকদূর এগিয়েও গেছে।

বাধ সেধেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। দিল্লির সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে আন্দোলন শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত প্রতিবাদপত্রে হাজার হাজার নাগরিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ, দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় ধর্না, পথসভা, সাইকেল মিছিল, জনগণকে নিয়ে আন্দোলনের কমিটি গঠন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে ৬ জুলাই পাঁচ শতাধিক মানুষের মিছিল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর অভিযান করে। ব্যানারে,প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত মিছিল রেডফোর্ট ময়দান থেকে রওনা হয়ে দরিয়াগঞ্জ, বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ হয়ে আই টি ও ক্রসিং-এ পৌঁছালে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি এবং পিইউসিএল-এর নেতা রাজেন্দ্র সাচার, এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল, সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রধান বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, জল বেসরকারিকরণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বা কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভুলও নয়। এটা পুঁজিপতিশ্রেণীর সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত নীতি। তিনি বলেন, গোটা বিশ্বেই পুঁজিবাদী দেশগুলি জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেনশন ইত্যাদিতে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাই করছে এবং এগুলিকে মুনাফা অর্জনের পণ্যে পরিণত করছে। তিনি আরও বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ মুমূর্ষু, অনিরসনীয় সংকটে জর্জরিত। সমাজকে সে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এই সংকট সমাধানে ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদ বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই নীতি শক্তিশালী গণআন্দোলনের দ্বারা বাতিল করাতে না পারলে জল বেসরকারিকরণের মতো জনবিরোধী নীতি পরাস্ত করা যাবে না।

বিক্ষোভ সভার পর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

ত্রিপুরা-মিজোরাম-বরাক ভ্যালির যাত্রী পরিষেবা নিয়ে আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

২০০৮ সালে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ হলেও সরকারে যাত্রী পরিষেবা তলানিতে। কামরাগুলি ভাঙাচোরা, অপরিষ্কার, লাইট ও পাখার ব্যবস্থা নেই, বাথরুমগুলি নোংরা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ জল থাকে না। টানেলগুলির মধ্য দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই ট্রেন চলাচল করে। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন চলাচল না করায় যাত্রীদুর্ভোগ চরমে। আগরতলা থেকে শিলচরে ট্রেন মধ্যরাত্রে পৌঁছায় আবার শিলচর থেকে আগরতলায় আসে। এ ছাড়া রয়েছে যাত্রী নিরাপত্তার অভাব। এ দিকে লামডিং থেকে ব্রডগেজ লাইন বদরপুর হয়ে আগরতলায় আসার কাজ ১০ বছর আগে শুরু হয়ে আর অগ্রসর হচ্ছে না। ফলে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বরাক ভ্যালির যাত্রী পরিষেবা ও মাল পরিবহণ যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। এ নিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছে।

ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে ২ জুলাই লামডিং ডিভিশনাল ম্যানেজারের উদ্দেশে আগরতলা স্টেশন ম্যানেজারের নিকট ৭ দফা দাবিপত্র প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য-সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক, সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী ও সঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ সাত জন সদস্য। স্টেশন ম্যানেজার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

আন্দোলনের চাপেই নয়ডায় জমি ফেরত

একের পাতার পর

করা হচ্ছে। সমাজে হিংসা-সন্ত্রাসবাদ বাড়ছে, কারণ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে মানুষের। এত যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, তার কারণও সেই একটাই— মানুষকে খাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। হতদরিদ্র মানুষ আদালতে আসতে পারে না। সরকারও গরিবদের দেখছে না।

সুপ্রিম কোর্টের কথাগুলি মানবিক দিক থেকে সহানুভূতিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই, তবে নতুন কথা নয়। এই কথাই দেশের নানা প্রান্তের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকারী কৃষকরা বলছিলেন, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, সমাজের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বিশিষ্ট মানুষরা বলছিলেন। যার স্বীকৃতি দিতে এখন সুপ্রিম কোর্ট, বলা যায়, কিছুটা বাধ্য হল। সিঙ্গুরে সিপিএম সরকার যখন টাটাদের মোটরগাড়ির জন্য চাষিদের থেকে এক হাজার একর জমির দখল নিয়েছিল এবং সিপিএম সরকার ও নেতারা এটাকেই 'শিল্পায়ন' বলে তুমুল প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দেশের অন্যান্য অংশের উদাহরণ তুলে ধরে বলেছিল, কারখানার জন্য এই বিপুল পরিমাণ জমির দরকার নেই। তিনশো একরই যথেষ্ট। মারুতির ক্ষেত্রে, হিন্দমোটরে অ্যাম্বাস্যাডরের ক্ষেত্রে এর বেশি জমি লাগেনি। আসলে টাটাদের লক্ষ্য ছিল কলকাতার কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ের মতো হাইওয়ের ধারে এই বিরাট পরিমাণ জমি নিয়ে তার সিংহভাগ অংশে শপিং মল, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, বিলাসবহুল আবাসন, সুইমিং পুল ইত্যাদি গড়ে তুলে তা থেকে শত-সহস্র কোটি টাকা মুনাফা করা।

উন্নয়নের নামে গরিব মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ দেশে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম মায়াবতী জয়ললিতা লালুপ্রসাদ সবার রাজত্বেই এ জিনিস চলে আসছে। এর ফলে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ, জীবন-জীবিকা থেকেই উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। গরিব কৃষক, সাধারণ মানুষ বহু দিন মুখ বুজেই এই অন্যায় মেনে এসেছে। সরকার-শিল্পপতি-আবাসন ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী দুষ্টচক্রের জমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। এই অসহায়তায় ছেদ পড়ল সেদিন, যেদিন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষ ঘোষণা করল, উন্নয়নের নামে দেশি-বিদেশি জমি হাঙরদের মুনাফার লালসা মেটাতে তারা জমি দেবে না।

সিঙ্গুরে সংগঠিত কৃষকদের লাগাতার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সরকার এবং টাটাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে। নন্দীগ্রামেও কয়েক হাজার একর কৃষিজমি ইন্দোনেশিয়ার সালিম ও মার্কিন ডাও কেমিকেল সহ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য দখল করতে চেয়েছিল সিপিএম সরকার। নন্দীগ্রামের লড়াকু মানুষ সংগঠিতভাবে তাকেও প্রতিহত করেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষক প্রতিরোধের এই সাফল্যের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে। যেখানেই জমি হাঙররা জমির দখল নিতে চাইছে, সেখানেই গড়ে উঠছে প্রতিরোধ। ব্যাপক পুলিশি অত্যাচার চালিয়েও সরকার তাকে আটকাতে পারছে না।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার আন্দোলন সারা দেশের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবদমিত মানুষকে সংগ্রামের দিশা দেখিয়েছে। এই আন্দোলন প্রমাণ করেছে, ব্যাপক জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে সঠিক পথে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে রাষ্ট্রীয় আক্রমণ প্রতিহত করে দাবি আদায় সম্ভব। নয়ডার কৃষক আন্দোলনেও সেই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। নয়ডার কৃষকদের সংগঠিত প্রতিরোধই সুপ্রিম কোর্টকে এই রায় দিতে বাধ্য করেছে। নয়ডার কৃষকরা যদি আন্দোলন গড়ে না তুলত, এবারও যদি মুখ বুজে সব মেনে নিত তবে এই রায় পাওয়া যেত না। অতীতে গরিব মানুষের উপর কম অত্যাচার হয়নি, রাষ্ট্র এবং পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের উপর লুণ্ঠন-অত্যাচার কম চালায়নি। কিন্তু নিপীড়িত মানুষের পক্ষে আদালতের এমন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বরং উল্টোটাই সাধারণত দেখা গেছে। বিশেষ করে নয়া উদারনীতিবাদী আর্থিক ও শিল্পনীতি চালু হওয়ার পর উন্নয়নের নামে সরকারের প্রায় সমস্ত শ্রমিক বিরোধী, কৃষক বিরোধী, জনবিরোধী নীতি ও আইনে সিলমোহর দিয়েছে আদালত। এটাই স্বাভাবিক। আদালত রাষ্ট্র ব্যবস্থারই প্রধান স্তম্ভ। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আদালতও সামগ্রিকভাবে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চলে, অন্যথা ঘটলে তাকে ব্যতিক্রম বলতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে নয়ডার প্রশ্নে কৃষক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

একদিকে বেকারি ও মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনজীবনের দুঃসহ অবস্থা, সরকারি মন্ত্রী ও আমলাদের সীমাহীন দুর্নীতি, অপরদিকে জমি লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে মানুষের ক্ষোভ যেভাবে বাড়ছে এবং তাকে ভিত্তি করে প্রতিরোধ আন্দোলন যেভাবে গণআন্দোলনের রূপ নিচ্ছে, তাতে আদালত সরকারকে দায়ী না করে পারেনি।

কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএমের ভণ্ডামি

নয়ডা সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়া কৃষক অন্দোলনের ময়দানে যুব কংগ্রেস নেতা, রাজীব গান্ধীর পুত্র রাহুল গান্ধীকে যেমন ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে, তেমনই এ রাজ্যের সিপিএম-সিপিআইকেও উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস নেতারা এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন কৃষকদের দুঃখে অস্থির হয়েই রাহুল ছুটে গেছেন সেখানে। কংগ্রেসের 'নতুন মুখ', ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষিত রাহুল গান্ধী কে? তিনি সেই কংগ্রেস দলেরই নেতা— যে কংগ্রেস দেশে শাসন ক্ষমতায় সবচেয়ে বেশি দিন অধিষ্ঠিত। দেশের মানুষের যাবতীয় দুর্দশা তো সেই কংগ্রেসেরই অনুসৃত নীতির ফল। যে কংগ্রেসের নেতা হিসাবে তিনি কৃষকদের দুঃখে মায়াকান্না কাঁদছেন, সেই কংগ্রেসই তো ক্ষমতাসীন রাজ্যগুলিতে বেপরোয়া গরিব কৃষকদের জমি দখল করে চলেছে। কংগ্রেসের নীতি এবং শাসনের কারণেই তো কৃষিপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ী, কালোবাজারি, মজুতদাররা কৃষকের উদয়াস্ত পরিশ্রমের সমস্ত ফল আত্মসাৎ করে পুঁজির পাহাড় জমাচ্ছে, আর কৃষকরা অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতে, লাখে লাখে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। এই কংগ্রেসই তো গত ছ'দশকে জমি দখলের ঔপনিবেশিক আইনকে বাতিল করা তো দূরের কথা, তাকেই হাতিয়ার করেছে। যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের প্রেরণায় নয়ডা সহ দেশের প্রান্তে প্রান্তে কৃষকরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, সেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে কংগ্রেস কী ভূমিকা পালন করেছিল? আক্রান্ত চাষিদের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, সমস্ত রকম ভাবে তারা কৃষকদের বিরুদ্ধে শাসক সিপিএম এবং জমি হাঙর টাটা-সালিমদেরই মদত দিয়ে গেছে। তখন কোথায় ছিলেন রাহুল গান্ধী? কোথায় ছিল তাঁর কৃষক দরদ? আজ যখন গোটা কংগ্রেস দলটি দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, একের পর এক মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতির কাহিনী প্রতিদিন প্রকাশ পাচ্ছে, নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার মানুষ কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, সরকার যখন মানুষের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, তখন দলের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা হিসাবে রাহুলকে কংগ্রেস নেতৃত্ব এই জমি আন্দোলনে হিরো বানানোর খেলায় নামিয়েছে। এ আসলে একদিকে দলকে এই চরম বিপর্যয় থেকে টেনে তোলার এবং অপরদিকে উত্তরপ্রদেশে ক্রমাগত গুরুত্ব হারানো দলকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কৃষকদের মধ্যে খানিকটা হলেও জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। আর একেই পুঁজিপতিদের টাকায় চলা মিডিয়া বিরাট প্রচার দিচ্ছে। নয়ডার কৃষক আন্দোলনের খবর যে সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় নিছক একটি সংবাদ হিসাবে কখনও স্থান পেয়েছে, কখনও পায়নি, তারাই রাহুল গান্ধীর নয়ডা সফরের ছবি ফলাও করে ছাপছে প্রথম পাতায়।

সিপিএম-সিপিআইয়ের ভূমিকাও একইরকম। যারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে চাষিদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে গণহত্যা-গণধর্ষণ চালাল, তারাই আজ চাষিদের এই আন্দোলনে 'আমরাও আছি' বলে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করছে। মেকি বামপন্থী এই দুষ্ট শক্তিগুলি সম্পর্কেও আন্দোলনকারী চাষিদের সাবধান থাকতে হবে। যেমন সাবধান থাকতে হবে কংগ্রেসের মতো বৃহৎ বুর্জোয়াদের মদতপুষ্ট অপর দল বিজেপি সম্পর্কেও। এই বিজেপি ছত্তিশগড়ে, কর্নাটকে, ওড়িশায় বিজেডির সহযোগী হিসাবে লক্ষ লক্ষ কৃষককে বঞ্চিত করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে জমির দখল তুলে দিচ্ছে, আর নয়ডায় গিয়ে ভোটে ফয়দা তুলতে কৃষকের জন্য চোখের জল ফেলছে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পথই কৃষক আন্দোলনের যথার্থ পথ। কোনও নামকরা নেতা, নামকরা দল নয়, সচেতন সংঘবদ্ধ কৃষকদের নিজস্ব হাতিয়ার চাষি কমিটি তথা গণকমিটিই পারে এই আন্দোলনকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে, জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন তাই দেখিয়েছে, পস্কো দেখাচ্ছে, নয়ডাও দেখাচ্ছে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

ভিক্ষাতুল্য বেতন আশা কর্মীদের
আন্দোলন গড়ে তুলতে ২২ জুলাই রাজ্য কনভেনশন

অ্যাক্রেডিটেড সোস্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্টদের সংক্ষিপ্ত নাম 'আশা' কর্মী। ওঁরা ভয়াবহ বঞ্চনার শিকার। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের অধীনে সাবসেন্টারগুলিতে কর্মরত এই কর্মীরা গ্রামীণ মানুষের কাছে, বিশেষ করে প্রসূতি মা ও শিশুদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত। মায়েদের প্রসবের পূর্বে ও পরের অবস্থায় দেখভাল করা, শিশুদের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা, গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করানো, ঔষধপত্রের হিসাব রাখা, রিপোর্ট দেওয়া প্রভৃতি কাজ তাঁদেরই করতে হয়।

এই ৬ ধরনের কাজের বিনিময়ে তাঁদের মাসিক মাত্র ৮০০ টাকা দেওয়া হয়। এই ভিক্ষাতুল্য টাকায় দুর্মূল্যের বাজারে একজন মানুষের চলতে পারে? প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাও তাঁদের নেই। আশা কর্মীদের কাজের যা বোঝা তাতে সারাদিন কাজ করার পরেও বাড়িতে বসে কাজ করতে হয়। অথচ না আছে তাঁদের স্বাস্থ্য কর্মচারীর মর্যাদা, না আছে বাঁচার মতো বেতন।

বঞ্চনার এখানেই শেষ নয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের স্বাস্থ্য মিশন অধিকর্তার এক নির্দেশ 'আশা' কর্মীদের বিরুদ্ধে আরও গভীর চক্রান্তে ভরা। ঐ নির্দেশে পূর্বের ৬ ধরনের কাজ বাড়িয়ে ২৬ ধরনের কাজ ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অন্যান্য ৯ ধরনের কাজ, মোট ৩৫ ধরনের কাজের বোঝা চাপানোর কথা বলা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষতিপূরণ। ভিন্ন ভিন্ন এলাকার 'আশা' কর্মীদের ঐ সমস্ত কাজ একইভাবে জুটবে না কিংবা জুটলেও দিন রাত কাজ করেও তা সম্পূর্ণ করা যাবে না। যে সমস্ত কাজ জুটবে বা সম্পূর্ণ করা যাবে তার ভিত্তিতে এক একজন 'আশা' কর্মীর ৩০০/৪০০ টাকার বেশি পাওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ আশাকর্মীরা এখন প্রতি মাসে যে ৮০০ টাকা ভাতা (যাকে ক্ষতিপূরণ বলা হয়) পেতেন তাও পাবেন না। এই অমানবিক ও অন্যায় সরকারি নির্দেশ আশা কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন আশা কর্মীরা।

২২ জুলাই বেলা ১২টায় কলকাতার ভারত সভা হলে এক রাজ্য কনভেনশনের আহ্বান করা হয়েছে। এক প্রচারপত্রে পশ্চিমবঙ্গ 'আশা' কর্মী ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে মিনতি মণ্ডল, মিনতি দত্ত, কল্পনা সরকার, বানাতুন্নাসা, রীণা কর্মকার, রীণা মণ্ডল, পাপিয়া অধিকারী, ইতি মাইতি, কেয়া খাতুন, বেবী বেগম, শিলা চক্রবর্তী ও হামিদা গাজী এই কনভেনশন সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বীরভূমে বিক্ষোভঃ ন্যূনতম ৬,৬০০ টাকা মজুরির সার্কুলারকে কার্যকর করা সহ ৫ দফা দাবিতে ৩০ জুন বীরভূম জেলার দুইশত 'আশা' কর্মী সিউড়িতে মিছিল করে গিয়ে সিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি জেলা সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান এবং শ্রমিক নেতা কমরেড কুদ্দুশ আলি। সিএমওএইচ স্মারকলিপি নিতে অস্বীকার করলে আশা কর্মীরা তাঁকে ঘেরাও করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি ঘোষণা করেন এই দাবিপত্র তিনি তাঁর সুপারিশ সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবেন।

মহান ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মেদিনীপুর জেলাকে বহু বিভাজনের পথে ঠেলে দেওয়া সমর্থনযোগ্য নয়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নামপরিবর্তন করে 'তাম্রলিপ্ত' করার প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানাল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি। জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি ১ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেছেন,

পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে 'তাম্রলিপ্ত' নামকরণ বাস্তবে বুঝে বা না বুঝে জেলাকে সংকীর্ণ বহু বিভাজনের পথে ঠেলে দেওয়ার উস্কানি হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। ২০০০ সালেই মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের বিরোধিতা করে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বলেছিল, জেলা বিভাজনের ফলে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এগুলি কোনও কিছুই হবে না। বরং বিদ্যাসাগর, রানি শিরোমণি, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, হেমচন্দ্রের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই জেলাকে বহু বিভাজনের পথে ঠেলে দেবে। আমাদের সেই কথা আজ সত্য প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আপসহীন প্রতিবাদী মানসিকতার ঐতিহ্যবাহী 'মেদিনীপুর' শব্দটি থেকে পূর্ব মেদিনীপুরবাসীদের বঞ্চিত করা হবে এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে বাস্তবে তাদের গৌরবময় পূর্বসূরীদের ইতিহাস থেকে ছিন্নমূল করে দেওয়া হবে।

'তাম্রলিপ্ত' নামকরণের প্রস্তাব আসার সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু মানুষ 'পশ্চিম' শব্দটি বাদ দিয়ে মেদিনীপুর নামকরণ চাইছেন। আবার সাথে সাথে কাঁথিতে আলাদা জেলা করার দাবি এখনই উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে অচিরেই কাঁথি, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি মহকুমাগুলির পৃথক জেলার দাবিদার হওয়ার পথে বাধা থাকবে না। এসবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত শাসন অত্যাচার জুলুম চালানোর প্রশাসনিক সুবিধা বাড়ানো হবে, আর মাথাভারি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া সমস্যাক্লিষ্ট জনগণের কোনও সুবিধাই হবে না।

তাই আমরা জেলার নামকরণ 'তাম্রলিপ্ত' করার পেছনে বুঝে না বুঝে বহু বিভাজনের যে আশঙ্কা আছে, তাকে প্রতিহত করার জন্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। বড় জোর মহকুমার নাম 'তাম্রলিপ্ত' রাখা যেতে পারে বলে মনে করছি।

২২ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক গভীর সংকটে শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ

এ রাজ্যের প্রায় ২২ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আজ চরম সংকটে। মালিক, ঠিকাদার ও সরকারের ত্রিমুখী শোষণ অত্যাচারে তারা জর্জরিত। ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী বর্তমানে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিড়ি শ্রমিকদের এক হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য মজুরি ১৫১.০৫ টাকা, হাওড়া ও হুগলিতে ১৩৬.৪১ টাকা, পুরুলিয়া বাদে অন্যান্য জেলায় মজুরি ১২৩.৯৭ টাকা। কিন্তু বাস্তবে শ্রমিকরা মজুরি পান ২৫ থেকে ৬০ টাকা। এছাড়াও মালিক ও ঠিকাদাররা পাতা ও তামাকের দাম কেটে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি আরও কমিয়ে দেয়।

বিড়ি শ্রমিক-কর্মচারীরা ১৯৭৭ সাল থেকেই প্রভিডেন্ট ফান্ড এর আওতায় এসেছেন। কিন্তু আজও রাজ্যের বেশিরভাগ শ্রমিক পিএফ-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আইন থাকা সত্ত্বেও মালিকরা এখনও লগবুক ও বোনাস চালু করেনি। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৬ সালে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ আইন তৈরি করে। কল্যাণ প্রকল্পের সুযোগ পেতে হলে শ্রমিকদের প্রয়োজন পরিচয়পত্র। আইন অনুযায়ী পরিচয়পত্র দেওয়ার কথা বিড়ি মালিকদের। কিন্তু মালিকরা সরকারি আইনের তোয়াক্কা না করে শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দিতে অস্বীকার করে। কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই আইন ভঙ্গকারী মালিকদের আইন মানতে বাধ্য করার উদ্যোগ নেয়নি। বরং পরিচয়পত্র দেওয়ার বিকল্প পথ তৈরি করেছে। ফলে দালাল চক্র ও দুর্নীতি চক্র গড়ে উঠেছে। বহু প্রকৃত বিড়ি শ্রমিক এখনও পরিচয়পত্র পাননি।

এমতাবস্থায় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ৭ জুলাই রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক আনিসুল আম্বিয়া ও নদীয়া জেলা সম্পাদক প্রবীর দে। শ্রমিকরা যাতে ন্যূনতম মজুরি পায় তা দেখা হবে এবং বিড়ি ওয়েলফেয়ার ফান্ডের দুর্নীতির তদন্ত করা হবে বলে শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছেন।

বাঁকুড়ায় জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির আন্দোলন

ওন্দা থানার নাকাইজুড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে এক জন ডাক্তার, দু'জন নার্স। আগে এখানে ১০টি বেড ছিল, বর্তমানে তাও নেই। এইসব সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৩ জুলাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশনের পর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সিএমওএইচের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। তিনি এক মাসের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

কৃষ্ণনগর ব্লক হাসপাতালে রোগীদের যে দুধ দেওয়া হয় তার তিন ভাগই জল। তাঁদের ওয়ার্ডের বাইরে গিয়ে লাইন দিয়ে খাবার নিতে হয়। ১০ জুলাই বিএমওএইচ-এর কাছে কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরের দিন থেকেই দুধের পরিবর্তে মিষ্টি দেওয়া শুরু হয়। কমিটি দাবি করেছে, রোগীদের খাঁটি দুধই দিতে হবে।

রানিবাঁধ ব্লক হাসপাতালে উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার-নার্স-সুইপার নিয়োগ এবং ৬০টি বেডই চালু রাখার দাবিতে কমিটি ১৭ জুন বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। আলোচনাকালে বিডিও সিএমওএইচ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করায় তিনি অবিলম্বে সমস্যাগুলি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কমিটির পক্ষ থেকে আন্দোলন ও নিয়মিত সহায়তা কেন্দ্র চালানোয় দালাল চক্র বন্ধ হয়েছে, বিপিএল তালিকাভুক্ত রোগীদের ২০০০ ও ৩০০০ টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে, ডাক্তাররা নিয়মিত আউটডোরে আসছেন, ইইজি এবং ইসিজি মেশিন সারানো হয়েছে। হাসপাতালের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দাবিতে ২৭ জুন সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তিনি বলেন, দাবিগুলি সঠিক। ১৫ দিন পরে তিনি আবার কমিটির সাথে আলোচনায় বসবেন।

ছাত্রী হেনস্থার প্রতিবাদে গুজরাটে নাগরিক প্রতিবাদ

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডাকা ছাত্র ধর্মঘটের প্রচারকালে ডি এস ও-র ছাত্রী কর্মীদের উপর পুলিশের অশালীন আচরণের প্রতিবাদে ৬ জুলাই আমেদাবাদে নাগরিকদের প্রতিবাদী সমাবেশ। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রকাশ ভাই শাহ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইলাবেন পাঠক, মানবাধিকার সংগঠন পি ইউ সি এল-এর সাধারণ সম্পাদক গৌতমভাই ঠাকর, অধ্যাপক রোহিতভাই শুক্লা প্রমুখ বহু বিশিষ্ট জন।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।